বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার একাদশ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন ২০১৭, বুয়েনোস আইরেস, আর্জেন্টিনা

না বাণিজ্য, না মানুষ

মারুফ বরকত

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) তার জন্মলগ্ন থেকেই পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এর ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষ সবচেয়ে বেশি যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছে তা হচ্ছে, 'মুনাফার আগে মানুষ', 'দুনিয়া বিক্রয়যোগ্য নয়', 'প্রাণের উপর পেটেন্ট নয়', 'কৃষক হত্যা করে ডব্লিউটিও', 'পৃথিবীর সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের একটি', 'নারী ও পৃথিবীর জন্য অভিশাপ' এবং আরো অনেক কিছু।

এ পর্যন্ত সম্পন্ন ১১টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চারটিই শেষ হয়েছে কোনো ঘোষণাপত্র (Ministerial Declaration) প্রকাশ না করে। সিয়াটল, কানকুন ও হংকং সম্মেলন ভেস্তে গেছে শ্রমিক-কৃষক আর সাধারণ জনগণের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে। ২০১৩ সালে বালিতে উঠে আসা দরিদ্র মানুষের জন্য ভর্তুকি দেয়া খাদ্য যোগানে সরকারী মজুদের প্রশ্নে আজ পর্যন্ত কোনো সমাধান খুঁজে পায়নি তারা। ধনী ও দরিদ্র দেশের অসমতা হ্রাসে প্রস্তাবিত বিশেষ ও পৃথক ব্যবস্থা (Special & Differential Treatment) প্রসঙ্গটি ফাইলচাপা পড়ে আছে এক দশকের বেশি সময় ধরে। প্রাণের উপর পেটেন্ট প্রত্যাহারের গণদাবিটি আজও আমলে নিতে পারেনি তারা। ব্যবস্থা করতে পারেনি দরিদ্র দেশের আরও দরিদ্র মানুষের বিশ্বব্যাপী মুক্ত চলাচলের অধিকারও (Mode 4)। মানুষের কথা, প্রাণের কথা উঠলেই সংস্থাটি অচল হতে বসে, আর আগায় না।

ভেতরেও রয়েছে বহু মতানৈক্যের অপ্রকাশিত খবর। বাণিজ্যমন্ত্রীরা নানা বিষয়ে নাখোশ থাকলেও নিজেদের স্বার্থে তারা তা প্রচার হতে দেন না। অনুন্নত দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা (Domestic Regulation) ভেঙে অবাধ বাণিজ্য নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় বিশ্বের নানা শ্রেণীর দেশ, কর্পোরেট ও বাণিজ্য মহলে এই সংস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কর্তারা প্রস্তাব দিয়েছে, এই সংস্থা ভেঙে দিয়ে কেবল দ্বিপাক্ষিক চুক্তি দিয়ে দেশে দেশে বাণিজ্য পরিচালনা করতে। উন্নত দেশগুলো এতে খুব আগ্রহী হলেও ক্রমশ শক্তি অর্জন করতে থাকা উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দলীয় বাধার মুখে তা বেশিদূর আগায়নি। যদিও অগোচরে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, দ্বিপাক্ষিক নানা অসম চুক্তি বসে নেই।

এরকম পরিস্থিতিতে ২০১৭ ডিসেম্বরে আর্জেন্টিনার বুয়েনোস আইরেসে সম্পন্ন হলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার একাদশ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। বাইরে তেমন কোনো জনবিক্ষোভ সেখানে হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্র সংগঠন আর কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন মিলে বড় জমায়েত করেছে অবেলিস্কো চত্বরে। কিন্তু সিয়াটল, কানকুন বা হংকংয়ের মতো অত উত্তুঙ্গ ছিল না যে সম্মেলন পন্ড হবে।

সম্মেলন কেন্দ্রের ভেতরেও মতানৈক্যের খুব জোর আওয়াজ ওঠেনি। কেউ ওয়াকআউট করেনি। তবু প্রায় ভেস্তে গেছে সম্মেলন। এবারেও কোনো উপসংহারে আসতে পারেনি ডব্লিউটিও। সংস্থার মহাপরিচালক রবার্তো আজেভেদো নিভু নিভু কণ্ঠে সমাপনী বক্তব্যে বললেন, 'আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকব। এখানে সব শেষ হয়ে যায়নি। বুয়েনোস আইরেসের পরও এটি আগের মতো চলমান থাকবে। কারণ বাণিজ্য বিষয়ে কথা বলার এখনও এটাই একমাত্র ফোরাম।'

দেশ ছাপিয়ে ওঠা বাণিজ্য সত্তার উত্তাপ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হচ্ছে রাষ্ট্রসমূহ। কোম্পানি নয়। তবে, স্বীকার না করলেও সবাই জানে, বাণিজ্য রাষ্ট্রের কারবার নয়। আগে পরে তা ঐ কোম্পানিরই, মুনাফাই যাদের কেন্দ্রীয় বিষয়। শক্তিশালী কোম্পানি তাদের রাষ্ট্রকে দিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আলোচনায় তাদের স্বার্থের বিষয়গুলোই বাস্তবায়ন করায়। তবু, এখন পর্যন্ত সরাসরি তাদের বক্তব্য এভাবে কখনও শোনা যায়নি। এবার খুব স্পষ্টভাবেই পাওয়া গেল তার আঁচ।

সম্প্রতি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ৫টি সবচেয়ে বড় কোম্পানি গুগল, অ্যাপল, ফেসবুক, আমাজন ও মাইক্রোসফট (৫টিই আমেরিকান) কোম্পানির জোট ও জাপান, কানাডা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় ই-কমার্স বিষয়ক আইনটি পুনর্লিখনের দাবি নিয়ে, যেখানে তারা আলোচনার বিধান বন্ধ করে বাধ্যবাধকতার আইন জুড়ে দিতে চায়। বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশও নিজেদের স্বার্থ না বুঝেই তাদের সাথে গলা মেলাচ্ছে। যদিও, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার কিছু দেশের আহ্বানে বেশিরভাগ উন্নয়নশীল বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ এর বিরোধিতা করছে। ১৯৯৮ সালের ডব্লিউটিও গৃহীত ই-কমার্স নীতিতে রাখা আলোচনার বিধান তারা বহাল রাখার দাবি জানাচ্ছে। এই নিবন্ধটি এই প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি দেশীয় সুরক্ষা নীতিমালা নিয়ে। যাতে কোনও দেশ চাইলে বহুজাতিক কোম্পানির বাণিজ্যিক আগ্রাসন থেকে তার নাগরিক, স্থানীয় শিল্প ও বাণিজ্যকে সুরক্ষা দিতে পারে।

সম্প্রতি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ৫টি সবচেয়ে বড় কোম্পানি গুগল, অ্যাপল, ফেসবুক, আমাজন ও মাইক্রোসফট (৫টিই আমেরিকান) কোম্পানির জোট ও জাপান, কানাডা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় ই-কমার্স বিষয়ক আইনটি পুনর্লিখনের দাবি নিয়ে, যেখানে তারা আলোচনার বিধান বন্ধ করে বাধ্যবাধকতার আইন জুড়ে দিতে চায়।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগসন্ধি

বিশ্ব আজ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মুখোমুখী। এর আগে তিনটি শিল্প বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৃটেনে। সেখান থেকে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বাদ দিলে, হস্তচালিত শিল্পের ধীরগতির উৎপাদন থেকে যন্ত্র দ্বারা দ্রুত গতির উৎপাদনই ছিল প্রথম শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল।

প্রযুক্তির উদ্ভাবন উনিশ শতকের শেষ দশকে বিশ্বকে উপহার দেয় দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব। একারণে একে প্রযুক্তি বিপ্লবও বলা হয়। যন্ত্রের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে নানা ধরনের প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিশেষ করে অটোমোশন হচ্ছে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের ফল। ইউরোপসহ পশ্চিমা দেশগুলোর হাতে একচেটিয়া প্রযুক্তি থাকার কারণে বিশ্ব বাণিজ্য একতরফা হয়ে যায় তখনই।

তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সূচনা ঘটে আইসিটির হাত ধরে। শিল্পে কেবল

অটোমোশন নয়, কম্পিউটার বা ডিজিটাল প্রযুক্তি শিল্প নিয়ন্ত্রণের অনেকটাই দখল করে নেয়। একবিংশ শতকের শেষ চতুর্থাংশ পৃথিবীকে ডিজিটাল বৈষম্যে দুই ভাগ করে ফেলে। আবারও আমরা দেখতে পাই, বাণিজ্যে পৃথিবীর উত্তর আর পশ্চিমের দেশগুলোরই একচেটিয়া ও অসম নিয়ন্ত্রণ।

অত্যাধুনিক আইসিটিও আজ বাণিজ্যে ব্রাত্য হতে চলেছে। বাণিজ্যের প্রধান হাতিয়ার হতে চলেছে ডাটা, অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য। দ্য ইকোনমিস্ট ডাটাকে বলছে 'নিউ অয়েল'। যার হাতে থাকবে এই ডাটার দখল, সেই পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করবে- এতে কোনো ভুল নাই।

নির্দিষ্ট কোনো দেশ নয়, ৪-৫ টি কোম্পানির হাতে ইতিমধ্যেই পুঞ্জিভুত হয়েছে সারা পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষের সকল তথ্য (ডাটা)। সেই ডাটা পুঁজি করে সূচনা হতে চলেছে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যের।[১] একেই বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4th Industrial Revolution)।

কত বড় সেই বাণিজ্য?

তথ্যকে পুঁজি করে গড়ে ওঠা ডিজিটাল বাণিজ্য কত বড় হতে পারে- ফেসবুক ইনকরপোরেশন তার জ্বলন্ত উদাহরন। ২০০৪ সালে চালু হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক। আমরা বলি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু এটি চরম লাভজনক একটি পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। প্রথম বছরে ৪ লাখ ডলার আয় দিয়ে শুরু করলেও পরের বছরই তা ৯ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়।[২] বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ২১৫০%। এরপর টানা ২০১১ পর্যন্ত তার প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮৫% এর উপরে।[৩] পৃথিবীতে এত লাভজনক ব্যবসা আর কোনটা আছে? না, কোনও পণ্য বিক্রয় করে সে মুনাফা করছে না। পৃথিবীর ২০৭ কোটি ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্যই তার মূলধন। মানুষের প্রকাশিত হবার বাসনাই তার প্রধান পুঁজি।

নির্দিষ্ট কোনো দেশ নয়, ৪-৫ টি কোম্পানির হাতে ইতোমধ্যেই পুঞ্জিভুত হয়েছে সারা পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষের সকল তথ্য (ডাটা)। সেই ডাটা পুঁজি করে সূচনা হতে চলেছে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যের। একেই বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4th Industrial Revolution)।

কোম্পানি যখন দেশের চেয়ে বড় হয়ে যায়

ফেসবুক ২০১৪ সালে হোয়াটসঅ্যাপ কিনে নেয় ২১.৮ বিলিয়ন ডলার দিয়ে। সেসময় বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২২ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বব্যাংকের জিডিপি র‍্যাংকিংয়ের ২০১৬ সালে করা ১৯৩টি দেশের তালিকায় ৮৯টির জিডিপি ছিল এর চেয়ে কম। ২০১৬ সালে ফেসবুকের বার্ষিক আয় ছিল ২৭.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে নেট মুনাফা ছিল ১০.২ বিলিয়ন ডলার। পৃথিবীর নিম্ন আয়ের পনেরটি দেশ মিলেও এত টাকার কথা ভাবতে পারে না।[৪]

ফেসবুক এত মুনাফা করলে সমস্যা কোথায়?

দুনিয়াটাই বাণিজ্যের ক্ষেত্র। বলা হয়, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। কেউ তার মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি বের করে যদি আয় করতে পারে, তো মন্দ কী? এত টাকা তো তারা কোথাও নিয়ে যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই এতে অনেক কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, ফেসবুক মাত্র ১৭ হাজার মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থান করেছে, ২০০৪ সালে তা ছিল মাত্র ৭ জন।[৫] স্বীকার করি, পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে তার কর্মসংস্থান করে ফেলেছে। কিন্তু, এতে ফেসবুকের কোনো কৃতিত্ব নাই। কাজটা তারা নিজেরাই করেছে। ফেসবুক না থাকলেও তারা তাদের কর্মসংস্থান করত।

সমস্যাটা অন্যক্ষেত্রে। অর্থনীতির ভাষায় বলা হয়, সরবরাহ আর চাহিদাই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। তবে, সংজ্ঞার নিচে ফুটনোটে বলা হয়, ইফ আদার থিংস রিমেইন সেম। কিন্তু আদার থিংস আর একই রকম থাকছে না। আরেক তত্ত্বেই বলা হচ্ছে, ক্রেতা আর ভোক্তার মধ্যে যার কাছে তথ্য থাকবে, যা অন্যজনের কাছে নেই, সেই হবে মূল্য নির্ধারণকারী। কাজেই মূল্য নির্ধারণ বলি বা সিদ্ধান্ত গ্রহনে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা, তথ্য যার কাছে আছে তাকে আটকানোর ক্ষমতা আর কারও নেই।

মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য ও বাণিজ্য

ডিসেম্বর ২০১৭ বুয়েনোস আইরেসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার একাদশ মন্ত্রী সম্মেলনের দিকে তাকিয়ে ছিল গুগল, অ্যাপল, ফেসবুক, আমাজন ও মাইক্রোসফট (GAFAM) নামের পাঁচ তথ্য বাণিজ্যের দিকপাল। ডিজিটাল বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রক নির্ধারক আজ তারাই। কারণ, এই পাঁচ কুতুবের কাছেই আছে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য। এদের বাইরে আর কোনো তথ্য নাই। বলাই বাহুল্য, পাঁচটিই যুক্তরাষ্ট্রের।

সবাই জানে, আগামী পৃথিবীর বাণিজ্য মানেই ই-কমার্স। কাগজের টাকার যুগ শেষ হতে চলল বলে। ইউরোপের অনেক দেশে টাকার ব্যবহার কমে গেছে। সুইজারল্যান্ডে প্রতি ৫টি লেনদেনের ৩টিই হয় ক্রেডিট কার্ডে বা অনলাইন ট্রান্সফারের মাধ্যমে। ২০১৫ সালে তার অনলাইন বিক্রয় ছিল ৮.৪ বিলিয়ন ডলার।[৬] এ ধরনের বাণিজ্যে ভোক্তাদের ব্যক্তিগত তথ্যের কদর অত্যন্ত বেশি। বলা যায়, সেটাই একমাত্র পুঁজি।

সেই পুঁজি ইতোমধ্যেই করায়ত্ত যাদের হাতে- সেই GAFAM চেয়েছিল, একাদশ ডব্লিউটিওর বাণিজ্য সম্মেলনে ভবিষ্যতের ই-কমার্সের নকশাটা তারাই করবে। উপরে উপরে এই নকশার মূল বক্তব্য, খোলা আলোচনার পথ বন্ধ করা এবং দ্বিপাক্ষিক মধ্যস্থতার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং বাস্তবায়নকারী সদস্যদের জন্য আইনী বাধ্যবাধকতার অবকাশ তৈরি করা। সোজা বাংলায় যাকে বলা যায়, না মানলে শাস্তির ব্যবস্থা করা। কিন্তু তাদের প্রস্তাবিত খসড়া দলিলের ভেতরের ধারাগুলো পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়, তারা যে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য করবে সেখানে যাতে কোনো বাধা না থাকে- এটাই তাদের বক্তব্য। এই বাধাগুলোর মধ্যে রয়েছে কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত কর, আমদানী-রপ্তানী শুল্ক ও নীতি ইত্যাদি। শুল্ক, অশুল্ক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়- সকল বাধা পরাভুত করে অবাধ বাণিজ্যই তাদের মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ তাদের নিয়ন্ত্রণ করার বা অপরাধ করলে শাস্তি দেবার কোনো উপায় তারা সদস্য রাষ্ট্রের হাতে রাখতে চাইছে না।

পরিস্থিতি তাদের এতটাই অনুকূলে যে, এ ব্যাপারে তাদের এক- দশমাংশ তথ্য রাখে এমন কোনো পার্টিই নেই- না কোনো দেশ, না কোনো সংস্থা।

তথ্য ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) এবং আমাদের শঙ্কা

অনলাইনে পণ্য বিক্রয় প্রতিষ্ঠান আমাজনের নাম আমরা সবাই জানি। আমাজন সাধারণ একটি কুরিয়ার সার্ভিস নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পণ্য বিপণনকারী এই কোম্পানির নিজের উৎপাদিত কোনো পণ্য নাই। অন্যের পণ্য বিক্রির কমিশনই তার আয়। আর এই কাজটিতে সে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত তথ্য। আপনার প্রয়োজন, রুচি, চাহিদা ইত্যাদি সকল

তথ্য তার হাতের মুঠোয়। আপনি তা চান বা না চান।

আমাজনের লোগোর দিকে তাকালে তীর চিহ্ন দেখেই বুঝবেন সেখানে এ থেকে জেড পর্যন্ত সবকিছু পাওয়া যায়। পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় বসে যে কোনো ধরনের পণ্য আপনি অর্ডার দিতে পারবেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এটা তো ক্রেতার জন্য সুবিধাজনক। সেটাই তারা প্রচার করে। কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, আপাত এই সামান্য সুবিধার বিনিময়ে কত বড় নীল নকশা তারা পেতে রেখেছে। সেদিন বেশি দূরে নয়, পৃথিবীর কোনো কোম্পানি আমাজনের বাইরে তাদের নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার ক্ষমতা রাখবে না। যদি এইভাবে চলতে থাকে।

সারা পৃথিবীতে আমাজনের পণ্য বিপণন বাণিজ্য এতটাই বিস্তৃত যে, পণ্যের চাহিদা তৈরি হবার জন্য সে বসে থাকে না। সে চাহিদা তৈরি করে। এখানেই প্রয়োগ হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারসাজি।

মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যকে পুঁজি করেই গড়ে ওঠে তাদের বাণিজ্য। এই তথ্য মানে কেবল আপনার নাম, বয়স, জন্মতারিখ বা ফোন নম্বর নয়। বরং, কে কে আপনার বন্ধু, আপনি গুগলে কী সার্চ করেন, আপনার রুচি কেমন, কোন জিনিস আপনার পছন্দ, আপনি নিয়মিত কোথায় যান, কী ধরনের ডিভাইস আপনি ব্যবহার করেন- সব তথ্য এনালাইসিস করে আপনার কম্পিউটার বা ডিভাইসের স্ক্রিনের আশেপাশে জড়ো হতে থাকে নানা লোভনীয় বিজ্ঞাপন। নগদ টাকার যেহেতু কারবার নেই, এক ক্লিকেই হয়ে যায় বাণিজ্য। বলা হচ্ছে, ২০২০ সালের মধ্যে ইন্টারনেটে যুক্ত ডিভাইসের সংখ্যা ৩১ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে।[৭] রাষ্ট্র ও সীমানার সকল 'বাধা' (যেমন, জনগণের স্বার্থে বা স্থানীয় শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে রাষ্ট্র আরোপিত রক্ষণশীল আমদানী নীতি) সরিয়ে কত বড় একটি সাইবার বাজার হবে সেটি, একবার কল্পনা করুন। সেই বাজারের ছড়ি থাকবে কার হাতে?

উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সরকার যাতে এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে, তার জন্য তাদের সিপাহসালার হয়ে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ।

এর বাইরে নগদ লেনদেন বা কাগজের টাকায় পণ্য বিক্রি হয়তবা একসময় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এখন যেভাবে গোপনে মাদক বিক্রয় হয়, ঠিক সেভাবে রাতের আঁধারে গরিব ও ইন্টারনেটবিহীন মানুষেরা কাগজের নোট দিয়ে পণ্য কেনাবেচা করবে। বিশ্বের বর্তমান বাণিজ্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে অকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ড. জেইন কিসলে তাঁর বক্তব্যে বলছিলেন এই কথা।

এই বিপুল বাণিজ্য যজ্ঞে একমাত্র বাধা বিভিন্ন দেশের রক্ষনশীল আমদানী নীতি। বিশেষ করে, স্থানীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেবার জন্য বা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে বিভিন্ন দেশে চলমান রক্ষণশীল আমদানী নীতি তাদের দুচোখের বিষ। আমাজন আর তার সঙ্গী সাথীরা মিলে ভেঙে ফেলবে আমদানী রপ্তানী বা শুল্কের বড় বাধা- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় তাদের উত্থাপিত প্রস্তাবনা পড়লেই তা বোঝা যায়। উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সরকার যাতে এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে, তার জন্য তাদের সিপাহসালার হয়ে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ।

তবে, একাদশ মন্ত্রী সম্মেলনের পর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা তাদের খুব বেশি খুশি করতে পারেনি।

ই-কমার্স নিয়ে কী হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায়?

১৯৯৮ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলনে প্রথম ই-কমার্স বিষয়ক আলোচনা উত্থাপন করা হয়।[৮] এ যাবত ডিজিটাল বাণিজ্য বিষয়ক এই আইন নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। কৃষি ও অন্যান্য বিষয় সবসময় নজর কেড়েছে। বলা যায়, এই বিষয়টি অনেকের নজরের বাইরেই থেকে গেছে। অথচ এর সুবিশাল গুরুত্ব এখন অনুধাবন করছে সবাই।

৫টি বৃহৎ তথ্য অধ্যুষিত কোম্পানির (GAFAM) নেতৃত্বে আমেরিকা, জাপান, কানাডা ও ইউরোপিয় ইউনিয়ন মূলত যা চাচ্ছে তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে-

- পৃথিবীর সকল মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যের উপর তাদের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে (Free Flow of Data)। শুধু প্রবেশাধিকারই নয়, তা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের সকল আয়োজন ইতিমধ্যে সম্পন্ন।
- তাদের বাণিজ্য সকল ধরনের অভ্যন্তরীই শুল্ক ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে;
- ১৯৯৮ সালের বিধান অনুযায়ী আলোচনার পথ বন্ধ করে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও আইনী বাধ্যবাধকতার সুযোগ তৈরি করতে হবে;
- অনেক দেশের নিয়ম অনুযায়ী ব্যবসা পরিচালনার জন্য স্থানীয় কার্যালয়ের উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে;

ইতোমধ্যেই বিভিন্ন দেশের সমালোচনা ও বাধার মুখে তারা কথা ঘুরাতে শুরু করেছে। তারা এখন বলছে, তারা আসলে এই আইনের আওতায় কিছু "টেকনিক্যাল বিষয়" সামনে নিয়ে আসতে চাইছে- যেমন ই-পেমেন্ট, ই-সিগনেচার এবং স্প্যাম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, বৈশ্বিকভাবে এসব বিষয় সমাধান করার জন্য অন্যান্য ফোরাম রয়েছে, ইউএন কনফারেন্স অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ল' (UNCITRAL) এবং ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU)। এ দুটি সংস্থা মানুষের অধিকারকে কেন্দ্রীয় বিষয় ধরে এসব বিধান তৈরি করেছে। শুরুতেই তারা উল্লেখ করেছে, বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট তথা আয়নস্ফিয়ারের মালিক হচ্ছে পৃথিবীর জনগণ, কোনো কোম্পানি বা দেশ নয়।

GAFAM আরও বলছে, তারা আসলে 'টেকনোলজিক্যাল নিউট্রালিটি' বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য কাজ করছে। যদিও তা ইতোমধ্যেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার মধ্যে রয়েছে।

এ থেকে বোঝা যায়, ধোঁকা দেয়াটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। যা থেকে আমাদের সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা: বাংলাদেশের ডাক বিভাগ

আমাদের দেশে ডাক বিভাগ একটি প্রায় অচল প্রতিষ্ঠান। দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনায় বহু আগেই প্রতিষ্ঠানটি জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষমতা হারিয়েছে। এই শূন্যস্থান পূরণ করে ব্যবসা করতে শুরু বেশ কয়েকটা প্রাইভেট কুরিয়ার সার্ভিস। ডাক বিভাগে যে চিঠি দুই টাকায় চলে যেত, তার জন্য শুরুতেই কুরিয়ার সার্ভিস নেয়া শুরু করল ১৫ টাকা। এটা সেই ১৯৯০-৯১ সালেই, তখনও ডাক বিভাগ চালু ছিল। এখন তাদের এই সেবার মূল্য নানা শ্রেণীতে কয়েক শতাংশ বেড়েছে। এই মূল্যের ব্যাপারে না আছে কোনো নজরদারি, না আছে কোনো নিয়মনীতি। যে যা পারছে নিচ্ছে। কেউ প্রশ্ন করল না, কেন ডাক বিভাগ বসে গেল, কেন কুরিয়ার সার্ভিস এত টাকা নিচ্ছে। কোথাও কোনও জবাবদিহিতা নাই।

তো সেই অচল ডাক বিভাগ কেন হঠাৎ করে মূল্যবান হয়ে উঠল আমাজনের কাছে? কী করবে তারা এ নিয়ে? ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের সাথে তাদের চুক্তি হয়ে গেছে ডাক বিভাগ নিয়ে (জুলাই ২০১৭)।

এতদিন বাংলাদেশে আমাজন বা আলিবাবার কোনো সেবা ছিল না। কিন্তু এখন ডাক বিভাগ নিজে ঘাড়ে করে দেশের প্রত্যন্ততম এলাকায় পৌঁছে দেবে আমাজন আলিবাবার পণ্য। বিনিময়ে ডাক বিভাগ কিছু কমিশন পাবে। শুধু তাই নয়, প্রবাসিদের পাঠানো যে রেমিট্যান্স ডাক বিভাগ নিজেই পৌঁছে দিতে পারত তাদের গ্রামের বাড়িতে, সেই রেমিট্যান্স আমাজন নিয়ন্ত্রণ করবে, ডাক বিভাগ কেবল তা বহনের ভূমিকা পালন করবে।

আলিবাবা আর আমাজন নামের দুই দৈত্য কোম্পানি ভাগাভাগি করে নিয়েছে দেশের ডাক সেবা। কী ধরনের চুক্তি হলো, কে কতটা সুবিধা পাবে- এ বিষয়ে প্রায় কোনও তথ্যই নাই কোথাও। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগেও আমরা কতটা তথ্যহীন। যখন কিনা আমার সকল তথ্যই তাদের হাতে চলে যাচ্ছে বিনা বাধায়। মনে রাখা দরকার, অবাধ তথ্য প্রবাহ আর অবাধ ডাটা প্রবাহ এক নয়। প্রথমটি দ্বিমুখী। কিন্তু ডাটা প্রবাহ কেবল একমুখী। মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য অবাধ ও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কোম্পানির হাতে চলে যাবার পদ্ধতি। প্রথমটার ফল হিসেবে কিছু সামাজিক উপকার থাকলেও দ্বিতীয়টির একমাত্র ফল কোম্পানির মুনাফা, এখানে মানুষের কোনো স্বার্থই নাই বলা চলে।

ডাক বিভাগের আয় ভবিষ্যতে আর না বাড়লে বা বন্ধ হয়ে গেলে কী ব্যবস্থা নেয়া যাবে, কিংবা ডাক বিভাগ বা সাধারণ কোনো ভোক্তা কোনো প্রকার বৈষম্যের শিকার হলে তার জন্য কী ব্যবস্থা- এসব বিষয়ে চুক্তির মধ্যে কী আছে, কী নাই তাও কোনো গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি। বরাবরের মতোই তা গোপন। অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট বাতিল হয়ে গেলেও এর সংস্কৃতি এখনও আমরা সযত্নে লালন করে চলেছি।

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, নাইকো বা অক্সিডেন্টালের মত বৃহৎ গ্যাস কোম্পানি যখন মাগুরছড়া আর টেংরাটিলায় গ্যাসক্ষেত্রে আগুন লাগিয়ে চলে গেল, তখন দেখা গেল চুক্তিতে এ ব্যাপারে কিছুই লেখা ছিল না। তারা সাবধানতার সাথে কাজ করবে- এই সরল বিশ্বাসের কথা লেখা ছিল। ফলে, আন্তর্জাতিক আদালতে নাইকোর সাথে মামলায় বাংলাদেশ হেরে গিয়েছে এবং যেখানে আমাদের ক্ষতিপূরণ পাবার কথা, সেখানে উল্টো আমাদের জরিমানা গোণার কথা শোনা যাচ্ছে।

আলিবাবা আর আমাজন নামের দুই দৈত্য কোম্পানি ভাগাভাগি করে নিয়েছে দেশের ডাক সেবা। কী ধরনের চুক্তি হলো, কে কতটা সুবিধা পাবে- এ বিষয়ে প্রায় কোনও তথ্যই নাই কোথাও। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগেও আমরা কতটা তথ্যহীন। যখন কিনা আমার সকল তথ্যই তাদের হাতে চলে যাচ্ছে বিনা বাধায়।

বহুজাতিক উবার ও স্থানীয় সিএনজি চালকদের ধর্মঘট

উবার হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস কোম্পানি গুলোর একটি। কিন্তু, এতবড় কোম্পানির মালাকানাধীন একটি গাড়িও নাই, একটি চালককে সে চাকরি দিতে পারেনি। তার মূল সম্পদ হচ্ছে, মানুষের যাতায়াত সংক্রান্ত তথ্য। গাড়ি বা চালক না থাকলেও এদের আছে বিশাল আইনজীবী বাহিনী, পরিবহন বিষয়ক সকল তথ্য সবার আগে পাবার ক্ষমতা, আর বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের বলে এরা পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে এদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে এমন যে কোনও দেশীয় কোম্পানি বা ব্যবস্থাকে অচল করে দেয় বা কিনে নেয়।[৯] বিশ্বের ৭৪টি দেশের ৪৫০টিরও বেশি শহরের ট্যাক্সি সেবা দখল করে নিয়েছে উবার।[১০]

বাংলাদেশে, ঢাকা শহরে ১৯৯৭ সালে চালু হয়েছিল আনুষ্ঠানিক ট্যাক্সি সার্ভিস। ১১,২৬০টি ক্যাব নিয়ে এর যাত্রা শুরু। ৪,৫১৩টি এসি আর ৬,৭৪৭টি নন এসি ট্যাক্সির পাশাপাশি চালু হয়েছিল প্রায় ছয় হাজার সিএনজি চালিত অটোরিকশা, সাবেকি আমলের বেবি ট্যাক্সিকে সরিয়ে দিয়ে।[১১] মিটারে চলা সেসব ট্যাক্সি বেশ সাফল্যের সাথে জনপরিহনের চাহিদা মেটাতে শুরু করেছিল। সস্তা নাহলেও নাগালের মধ্যে ছিল সেসবের ভাড়া।

কিন্তু হঠাৎ করে সেসব উধাও হয়ে গেল কী করে রাতারাতি? সংকটটা কোথায় বুঝে উঠার আগেই বিদায় নিল নাভানা, স্যালিডা, ওরিয়নের সেসব ট্যাক্সি। অচল হয়ে গেল সিএনজি অটোরিকশার মিটার।

সেই চরম অরাজকতার ফল হিসেবে আমরা দেখলাম, ঢাকায় মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যক প্রাইভেট গাড়ি নামল। বিআরটিএ'র হিসেবে ২০১৬ সালে প্রতিদিন ৫৫টি করে ব্যক্তিগত গাড়ি নেমেছে ঢাকার রাস্তায়, ঢাকা শহরে যার মোট নিবন্ধিত গাড়ির সংখ্যা ২ লাখ ৫৬ হাজার।[১২] যা ঢাকার মাত্র ৬% মানুষের যাতায়াতে ব্যবহার হচ্ছে, ৭৬% রাস্তা তা দখল করে আছে।[১৩] ঢাকায় এখন কোনো নন-এসি ট্যাক্সি ক্যাব নাই। সব মিলিয়ে এখন ট্যাক্সির সংখ্যা প্রায় ৫০০। ২০০৪ সালে ট্যাক্সিবিহীন ঢাকা শহরে প্রধানমন্ত্রী বেশ ঘটা করে ৪৬টি হলুদ ট্যাক্সি দিয়ে দ্বিতীয় দফায় ট্যাক্সি সেবা উদ্বোধন করেন। দুই কোটি মানুষের শহরে ৫০০ ট্যাক্সি আর প্রায় হাজার চারেক সিএনজি অটোরিকশা চাহিদার মরুভূমিতে কয়েক ফোঁটা জল মাত্র।

৯৪% সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সংকট রয়েই গেল। কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট এই বাজার সংকট কাজে লাগিয়ে সুরুৎ করে ঢুকে পড়ল উবার। যার একমাত্র বিকল্প হচ্ছে চড়া মূল্যের এসি ট্যাক্সি [তমা বা ট্রাস্ট ট্যাক্সি] অথবা অরাজকতায় ভরা সিএনজি অটোরিকশা। যে কোনও গোলোযোগে কে লাভবান হলো তা থেকেও হিসাব করে বের করা হয়, সেই গোলযোগের জন্য দায়ী কে। এটা বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

আমরা কি ধরে নেব, প্রাইভেট গাড়ি বিক্রি আর উবারের প্রবেশপথ তৈরির উদ্দেশ্যেই ঢাকা থেকে ট্যাক্সি ক্যাব ধীরে ধীরে তুলে দেয়ার পরিস্থিতি তৈরি করা হলো? অটোরিকশার লাইসেন্সের দাম বাড়িয়ে, দৈনিক ভাড়া বাড়িয়ে, নতুন লাইসেন্স বন্ধ করে দিয়ে কারা কী উদ্দেশ্যে সেই অরাজকতাকে ঘনীভূত করল?

বড় প্রশ্ন হচ্ছে, বেশিরভাগ মানুষের স্বার্থ বিবেচনা করে এক্ষেত্রে কেন দেশীয় কোনও নীতিমালা করা তৈরি হলো না? স্থানীয় সুরক্ষা নীতিমালা না থাকলে বহুজাতিক কোম্পানির হাতে যে উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশ জিম্মি হয়ে পড়ে- বিভিন্ন দেশে তার উদাহরণ তৈরি করেছে উবার।

এই উবারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের ডেকেছিল অটোরিকশা চালক সমিতি। তবে, চালকেরা বা তাদের সমিতি সমস্যার গোড়া চিনতে ভুল করলেন। সংকটের শহরে মুহ্যমান ও উবারের আপাত আরাম পেতে থাকা ঢাকাবাসীর সামান্যতম সমর্থন তারা পেলেন না। কারণ, মালিকের ভাড়া, রাস্তাঘাটে পুলিশ ও মাস্তানের চাঁদা মিটিয়ে ঘরে কিছু টাকা নিয়ে যেতে যাত্রীকে জিম্মি করা ছাড়া তাদের সামনে সামান্য পথই খোলা ছিল। তাদের নামে পত্র-পত্রিকায় যেসব দাবি এসেছে, অনেক চালকের সাথে আলাপ করে তাদের দাবির সাথে তার কোনো মিলই ছিল না। প্রশ্ন আসে, সেসব দাবি আসলে কাদের ছিল?

অটোরিকশা মালিকদের সিন্ডিকেট ভাঙতে না পারলে লাভবান হবে উবার। একচেটিয়া ব্যবসা শুধু না, ব্যবহারকারীদের বহু মূল্যবান ডাটাও তারা হাতিয়ে নেবে একেবারে মুফতে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের আবেগ ও বিকাশমান ক্ষুদ্র উদ্যোগ

ডব্লিউটিওর একাদশ মন্ত্রী সম্মেলনে উত্থাপিত ই-কমার্স রুলসকে ঘিরে বিশ্বব্যাপী সুশীল সমাজ সবচেয়ে বেশি যে আলোচনা করেছেন, তার সার কথা হচ্ছে, 'ই-কমার্স আর ই-কমার্স রুলস এক কথা নয়'। ই-কমার্স ভালো জিনিস। গ্রামে গঞ্জের অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা ইন্টারনেট সেবা, অনলাইন ব্যাংকিং, ফেসবুকসহ নানা অ্যাপ ব্যবহার করে কর্মসংস্থান গড়ে তুলছেন বিশ্বব্যাপী। এতে করে গ্রামেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পালে বেশ হাওয়া লেগেছে। কিন্তু এর সাথে যে প্রস্তাবিত ই-কমার্স রুলসের সম্পর্ক খুবই কম, সেটাই বুঝতে পারছেন না স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্য মন্ত্রী ও সরকারী ডেলিগেটদের। অথবা, বুঝলেও তাদের হাত-পা বাঁধা নানা দ্বিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী।

বাংলাদেশেও আমরা বিষয়টিকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নামক আবেগময় স্লোগানের সাথে গুলিয়ে ফেলতে দেখেছি। প্রস্তাবিত ই-কমার্স রুলসের কোথাও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য কোনো সুবিধার বালাই নেই। বরং, তাদের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের নেয়া নানা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার প্রস্তাব দেয়া আছে। আমাজনের মতো দৈত্য সংস্থার ই-বাণিজ্য একচেটিয়া করতেই এই প্রস্তাবনা।

গুগল, অ্যাপল, ফেসবুক গংদের অবাধ ডাটা সংগ্রহের যে জাল বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত, সেখানে ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবের তথ্যও আর গোপন থাকছে না। ব্যাংক হিসাব সুরক্ষিত থাকে সোর্স কোড দিয়ে, সে সুরক্ষা আলগা করার প্রস্তাব দেয়া আছে ই-কমার্স রুলসে। জাপান, ইউরোপ ছাড়া অনেক দেশেই গ্রাহকের অনলাইন ব্যাংক হিসাব খুব সুরক্ষিত নয় কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রতিকারের ব্যবস্থা খুব জোরালো ও সুনির্দিষ্ট নয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অ্যাপ গেটওয়ে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য অনলাইন ব্যবসার প্রধান টুল হচ্ছে অ্যাপ। আর অ্যাপের জন্য সারা পৃথিবীতে মাত্র দুইটি গেটওয়ে রয়েছে, একচেটিয়াভাবে যা কেবলমাত্র গুগল আর অ্যাপলের হাতে। কোনো রাষ্ট্র বা বহুজাতিক কোনো সংস্থার হাতে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই। এমনকি সরকারও যদি কোনো অ্যাপ বানাতে ও ব্যবহার করতে চায়, তাহলে হয় আই-ওএস অথবা গুগল প্লে- এই দুটোর যে কোনো একটা বা দুটোই তাকে বাধ্যতে গ্রহন করতে হবে- যে কোনো মূল্যে, যে কোনো শর্তে। কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমের যেমন অনেক ওপেন সোর্স বের হয়েছে- এন্ড্রয়েড বা আই-ওএসের বিকল্প কোনো ওপেন সোর্স এখনও সুদূর পরাহত। যার অনিবার্য ফল একচেটিয়া ব্যবসা ও শর্ত আরোপের ক্ষমতা।

এমন অবস্থায় ডিজিটাল বাংলাদেশ আবেগ দিয়ে অবাধ তথ্য প্রবাহ আর অবাধ ডাটা প্রবাহ এক করে দেখলে, ই-কমার্স আর ই-কমার্স রুলস এক করে দেখলে তা আমাদের সর্বনাশই ডেকে আনবে।

উপসংহার

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কোনো কালে মানুষের ছিল না। যদিও তাদের মূল স্লোগানের একটি হচ্ছে বাণিজ্যই উন্নয়নের চাবিকাঠি। যদিও, সেই উন্নয়ন কার, কাকে বলে উন্নয়ন- সে বিষয়ে এখনও বহু আলোচনার পথ বাকি। বহু কিছু নির্ধারণ করা বাকি।

ক্রমশ দেখা যাচ্ছে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বিশ্ব বাণিজ্য এবং তার কর্তাদের আর খুব খুশি করতে পারছে না। এমন ভাবার অবকাশ নাই যে, এতে বোধহয় ক্রমে মানুষের দাবির জয়জয়কার হচ্ছে। একাদশ মন্ত্রী সম্মেলনের পর সুশীল সমাজের ভেতর বেশ সন্তুষ্টি দেখা গেল। বাংলাদেশসহ অনেক দেশ প্রত্যাশার বাইরে গিয়ে ই-কমার্স রুলস প্রস্তাবনার পক্ষে স্বাক্ষর করেনি- এই তাদের সাফল্য। কিন্তু সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিশ্ব বাণিজ্য বিষয়ে, তার একচেটিয়াকরণ বিষয়ে চিন্তা ভাবনার অগ্রগতি হয়েছে কি? না হয়ে থাকলে সাময়িকভাবে স্বাক্ষর না করায় খুব বেশি লাভ নাই। একটা কথা বহুল প্রচলিত- নো ডিল ইজ বেটার দ্যান ব্যাড ডিল। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, নো ডিলে আমোদিত হবার কিছু নাই। কারণ, ব্যাড ডিলের সম্ভাবনা থেকেই যায়। গুড ডিলের ব্যবস্থা করাই সেখানে একমাত্র কাজ।

স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মুনাফা সবসময় মানবাধিকারের জন্য হুমকি। ডিজিটাল বাণিজ্য বিদেশি কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত হলেও তাকে দেশিয় ট্যাক্সের আওতায় আনতে হবে। কেউ ক্ষতির শিকার হলে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহনের বিধানের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে কাজ করতে হবে। আমাজন কোনো রাষ্ট্রীয় করের আওতায় আসার পক্ষপাতি নয়। এমনকি, ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ক্রেতার অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যাপারে দেশীয় কোনো ব্যবস্থাও তারা গ্রাহ্য করছে না। সবচেয়ে বড় কথা, সাইবার স্পেসে দেশের সীমানা টানা অসম্ভব ব্যাপার।

ফেসবুক, গুগল, অ্যাপল, মাইক্রোসফট সহ এসব কোম্পানির হাতে ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদ নয়। নিরাপত্তার দাবিতে পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজ মিলে যৌথভাবে সুরক্ষা গড়ে তুলতে হবে। তাদের অবাধ বাণিজ্যে মানুষের সুরক্ষার স্বার্থেই লাগাম পড়াতে হবে। তাদেরকে স্থানীয়ভাবে রাজস্বের আওতায় আনতে হবে এবং ভোক্তার আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় মানুষের উর্ধ্বে মুনাফা হয় এমন সকল বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতা করতে হবে। দেশের চেয়ে বড় কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য প্রস্তাব প্রতিহত করতে হবে। তা না হলে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীন সুরক্ষা বলে পৃথিবীতে আর কিছু অবশিষ্ট্য থাকবে না।

ধনী দেশের সাথে দরিদ্র দেশের অসম বাণিজ্য রুখতে, কৃষি মৎস্যসহ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় সকল চুক্তি পর্যালোচনা করে গণমুখী চুক্তির সুযোগ তৈরি করতে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে থেকে আওয়াজ তুলতে হবে। কিছু না বুঝেই সামান্য ও স্বল্প মেয়াদী লাভের আশায় ধনী দেশ ও কোম্পানির পক্ষাবলম্বন করা খাল কেটে কুমীর আনার চেয়েও বড় বিপজ্জনক। কারণ, এই কুমীর খাল না কাটলেও আসে।

মারুফ বরকত: লেখক।
ইমেইল: bmaruf@gmail.com

তথ্যসূত্র:

১. Dr. Burcu Kilic, et al, A new digital trade agenda: are we giving away the Internet?, Open Democracy, June 2017
২. Facebook Revenue, YCharts (Modern Financial Data Research Platform), Sept 2017
৩. https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
৪. বিশ্বব্যাংক ডাটা ক্যাটালগ, জিডিপি র‍্যাংকিং, ২০১৬
৫. Statista, The Statistics Portal, Number of Facebook Employees
৬. ইকমার্স ইন সুইজারল্যান্ড, ইকমার্স নিউজ ইউরোপ, জুন ২০১৭
৭. গার্টনার ইনকরপরেশন, গার্টনার রিলিজ জানুয়ারি ২০১৭
৮. The Geneva Ministerial Declaration on global electronic commerce, May 1998
৯. ডেবোরাহ জেমস, ই-কমার্স এন্ড ডব্লিউটিও, ২০১৭, আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইজ নট ফর সেল।
১০. দ্য ডেইলি স্টার, ২৭ নভেম্বর ২০১৬
১১. দ্য ডেইলি স্টার, ২৭ নভেম্বর ২০১৬
১২. বিআরটিএ, ২০১৬ পর্যন্ত
১৩. দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ৪ অক্টোবর ২০১৭